বিশেষ ক্রোড়পত্র

বিশেষ ক্রোড়পত্রটি
সাপ্তাহিক ২০০০ ও

Action on Disability and Development

এডিডি বাংলাদেশ-এর
যৌথ উদ্যোগ

আমরা নিজেদের কথা বলতে এসেছি

আমরা নিজেদের কথা বলতে এসেছি। আপনাদেরকে আমাদের কথা, ব্যথা আর আনন্দের গল্পগুলো জানাতে এসেছি। আমরা দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। মোট জনগণের দশ ভাগ। প্রতিবন্ধী, কিন্তু মনোবল আর সাহস আমাদের অটুট। চিরকাল আপনাদের কথা শুনেছি। আজ আপনারা আমাদের কথা শুনুন। আমাদের বলার সুযোগ দিন। বলার অধিকার আমাদের মৌলিক জন্মগত। আমাদের কিছু চাওয়া আছে, দাবি আছে। স্বপ্ন আমাদের আকাশ ছোঁয়া, লড়াই করার মানসিকতা প্রবল। আমরা দয়া চাই না, সহযোগিতা চাই। অনুরোধ জানাই, আপনারা আমাদের আন্দোলন আর কর্মসূচির পক্ষে দাঁড়ান। ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস। দিবসটি আমাদের কিন্তু এই দিবসকে আমরা সার্বজনীন করে তুলতে চাই। আমাদের পরিচয় আগে মানুষ পরে প্রতিবন্ধী। বাবা-মা, সমাজপতি, রাষ্ট্রের সেবক- আপনারাই বলুন প্রতিবন্ধী কি কখনও কোনো মানুষের পরিচয় হতে পারে? আমরা মানুষ হিসেবে রাষ্ট্রের কাছে, রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে সব প্রতিষ্ঠানের কাছে সমঅধিকার চাই। আমাদের জন্য শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, কর্মের সুযোগ নেই। দরিদ্র নই, তারও নিচে আমাদের বসবাস। আমরা জানতে চাই কেন? আমরা কি আপনাদের সন্তান, ভাই-বোন বা আত্মীয় নই? তবে আমাদের প্রতি এতো অবহেলা কেন? আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা এসেছি। সরকার দরিদ্র ব্যক্তিদের উন্নয়নে, দারিদ্র্য বিমোচনে দলিল তৈরি করছে। আমরা জানতে চাই সেখানে আমাদের অংশগ্রহণ কোথায়? আমরা কি রাষ্ট্রের নাগরিক নই? আমাদের বাদ দিয়েই কি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন হবে? সংখ্যায় আমরা ১ কোটি ৪০ লাখ। মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ। রাষ্ট্রের প্রতিটি পর্যায়ে ১০ ভাগ অংশগ্রহণ আমাদের থাকতে হবে। আমরা পড়তে চাই, শিক্ষিত হতে চাই, সরকারি-বেসরকারি কর্মের সুযোগ চাই, জীবন থেকে সব বৈষম্যের অবসান চাই। রাষ্ট্রের কাছে মানুষ এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি চাই। সংবিধান আমাদের এই অধিকার দিয়েছে, আপনারা তো কথায় কথায় সংবিধানের কথা বলেন, সংবিধান দিয়েই না হয় আমাদের অধিকারগুলো সুরক্ষিত হোক। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদারিত্ব আমাদের অধিকার। সংসদে আমাদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষিত আসন চাই। দেশের আর দশ জনের মানবাধিকার আর মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত হলে আমাদেরও মানবাধিকার রক্ষা করতে হবে। মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

নিজেদের কাজ আর আন্দোলনে আমাদের রয়েছে গভীর বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয়। আমাদের আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক। প্রতিবন্ধিত্ব আমাদের গণতান্ত্রিক চর্চায় কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

প্রধান সমন্বয়ক : সাইফুল হাসান
সহযোগিতায় : মোশাররফ হোসেন, এহসানুল করিম, ফায়াজউদ্দিন আহ্‌মদ, আদন ইসলাম মৌ, জব্বার হোসেন
ছবি : আনোয়ার মজুমদার ও খালেদ সরকার
গ্রাফিক্স : রেজাউল হোসেন

প্রতিবন্ধীরা আজ আর অসহায় নয়। আমরা আজ শুধু আপনাদের কথা শুনতে অভ্যস্ত নই, শোনানোর জন্যও প্রস্তুত। আমরা প্রতিবাদ করতে শিখেছি। আমরা সংগঠিত হয়েছি, হচ্ছি ঘরের কোণে পড়ে থাকা আলাদা ধীরে ধীরে, বলিষ্ঠভাবে। অবহেলিত কেউ নই আর আমরা। প্রত্যেকে আজ এক সত্তা। চাওয়া-পাওয়াও এক। আমরা আজ সম্মিলিত শক্তি। আন্দোলন, সংগ্রাম আর অধিকারের প্রশ্নে আমরা সচেতন। আমাদের সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে দেশের প্রতিটি কোণ থেকে একস্বরে একই আওয়াজ তুলছি আজ। প্রত্যেকের এক কণ্ঠ। দমিয়ে রাখার দিন শেষ, আজ জেগে ওঠার সময়, জীবনের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানোর সময়।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে আমরা নতুন আর অর্জন সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবার শপথ নিচ্ছি। আমরা জানি A Voice of our own...আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে বিভিন্ন জেলার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের ভাবনা তুলে ধরেছেন...

প্রথম বাধা হলো সরকারি

মোঃ নূরুজ্জামান

নাটোর

অনেকগুলো প্রতিবন্ধী একত্রিত হয়ে এক সঙ্গে একটা ব্যানারে আসতে পেরেছি এটা একটা ভালো দিক। আমি নিজে কোনো জায়গায় কিভাবে যাবো সেই ভাবনা কখনও ভাবতে পারি নাই। আজকে এই সংগঠনের মাধ্যমে আমি নাটোর জেলা প্রতিবন্ধী ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছি। আমি এটা আমার জীবনের একটা বড় পাওয়া বলে মনে করি। নাটোর জেলায় অভিষেক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী আমাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিয়েছে সেটা আমার বড় পাওয়া।

সংগঠন করে সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের অনেক ভালোই অর্জিত হয়েছে অনেকগুলো হয় না। আজকে সমাজে আমরা যেখানেই যাই হয়তো অনেক কাজ হয়ে যায় কিন্তু আরো করার অনেক বাকি রয়েছে।

প্রথম বাধা হলো সরকারি। চাকরির ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মের জায়গাগুলোতে অনেক বাধা রয়েছে। দ্বিতীয়ত বাধা হলো সামাজিক। সমাজের সব পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ উন্নয়নমূলক কমিটিতে প্রতিবন্ধীদের নেয়া হয় না। খাস জমি বরাদ্দ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দেয়া হয় না। সরকারি কাজে দলীয়করণের প্রভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সেখানে ভিড়তে পারে না। তেমনি এই সব বাধায় সরকারিভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে, বাধা দূর করা, হয় প্রতিবন্ধীরাও সেখানে অংশগ্রহণ করে তাহলে প্রতিবন্ধীদের জীবন উন্নত হবে।

মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে

মোছাঃ মরিয়ম ইসলাম বিনা

পাবনা

মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। পরিবারের কাছে চাওয়া পাওয়ার অধিকার। স্বামীর ঘর করার অধিকার আছে। আমি নিজে হাসিখুশি ভাবে চলতে পারবো সে অধিকার। অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। সমাজের জন্য ও রাষ্ট্রের জন্য কিছু করণীয় অধিকার আছে। সুযোগ দিলে আমাদের মতো প্রতিবন্ধী ছেলেরা বা মেয়েরা দেশের জন্য কাজ করতে পারবে বেশি খুশি হবো। আমরা মনে করবো যে দেশের কাজের জন্য আমাদেরকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছে।

আইনগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না

ফিরোজা আক্তার সীমা

রাজশাহী

আমার কাছে মনে হয় প্রতিবন্ধীদের জন্য যেসব আইন রয়েছে সেসব আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আমার পরামর্শ হচ্ছে, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যেসব কর্মকর্তা রয়েছে এবং সমাজের যেসব সচেতন লোক সবাইকে এই প্রতিবন্ধীদের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে আন্দোলনে একমত হতে হবে। সমাজের কাছে আমার প্রত্যাশা যে, প্রতিবন্ধী হলেও সবাই মানুষ। যখন প্রতিবন্ধীরা বের হয়, রাস্তাঘাট দিয়ে যাতায়াত করে তখন যেন সমাজের লোক প্রতিবন্ধীদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে বা কু-দৃষ্টিতে না তাকায়। প্রতিবন্ধীদের জন্য তাদের যে একটা খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি আছে, এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি পরিবর্তন করা যায় তা হলে এই বাধা থাকবে না। রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অংশগ্রহণে এখনো তো আমরা সেরকমভাবে যেতে পারিনি। মানুষের যে ছয়টি মৌলিক অধিকার রয়েছে সে অধিকারগুলো যেন স্বাভাবিক লোকদের পাশাপাশি প্রতিবন্ধীরাও উপভোগ করতে পারে।

মানুষের সচেতনতার অভাব হলো প্রধান বাধা

মোছাম্মত জলি বেগম

মাগুরা

আমাদের প্রতিবন্ধীদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরি পাওয়া উচিত। গাড়ির সিটের ব্যাপারে এখনও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন হয়নি। ব্যাংক থেকে এখনও লোন পায়নি। সমাজের মানুষ আমাকে নাম ধরে ডাকুক সেই সঙ্গে সমাজের মানুষের ভালবাসা চাই, তাদের কাছে গেলে যেন সহযোগিতা করে। আমার অধিকার যেন আদায় হয়। ঠিক ভাবে যেন ভোট দিতে পারি। আইন আদালতে যেন আমি সুষ্ঠু বিচার পাই। মানুষের সচেতনতার অভাব হলো প্রধান বাধা। মানুষকে বোঝাতে হবে এর জন্য বিষয়গুলো সবার সামনে তুলে ধরতে হবে।

‘পিআরএসপিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশীদারিত্ব থাকা প্রয়োজন’

মোশাররফ হোসেন *কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, এডিডি বাংলাদেশ*

সাপ্তাহিক ২০০০ : আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের আগ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী পিএসপিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। এটি আপনাদের দাবিও ছিলো। তো ব্যাপারটিকে কিভাবে দেখছেন?

মোশাররফ হোসেন : প্রধানমন্ত্রী, পিএসসি সংক্রান্ত যে ঘোষণা দিয়েছেন এটা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় এটাই প্রমাণিত হয় যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দাবি অযৌক্তিক ছিলো না। প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী এই ঘোষণার জন্য এডিডির পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ। সমস্যা হচ্ছে আমাদের দেশের বাস্তবতায় সরকারের যে কোনো নীতির বাস্তবায়ন হতে অনেক সময় লাগে। ’৮৬ সালে আমি জানতে পারি বিসিএস পরীক্ষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। দেখেন তখন থেকেই আমরা এই বিষয়ে প্রতিবাদ করে আসছি। এটাকে কার্যকর করতে আমাদের ১৭ বছর লেগে গেলো। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক ঘোষণায় আমরা যতোটা খুশি হয়েছি, সিদ্ধান্তের দ্রুত বাস্তবায়ন ঘটলে আমরা আরও খুশি হবো। অন্যদিকে এই অর্জনের ফলে আগামী দিনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলন আরও সুসংহত হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আরও সংগঠিতভাবে তাদের দাবির পক্ষে সোচ্চার হবে।

২০০০ : পিএসসি বিষয়ে মূল কৃতিত্ব এডিডি বাংলাদেশের...

মোশাররফ হোসেন : এরকম কথা আমরা বলতে চাই না। আমরা যেমন এই দাবির পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/শিক্ষার্থীরাও অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে। সরকারের প্রতি চাপ প্রয়োগ করতে মিডিয়ারও বড় ভূমিকা আছে। আমি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কথা বলতে চাই। পিএসসির বৈষম্যমূলক আচরণের বিপক্ষে তাদের দৃঢ় অবস্থান আমাদের দাবিকে সুসংহত করেছে। তারপর বিসিএস পরীক্ষার হল থেকে প্রতিবন্ধী ছাত্রদের বের করে দেয়া হলে তারা মামলা করে। এরকম অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করেছে। সুতরাং এই কৃতিত্ব দেশের পুরো প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর।

২০০০ : বাংলাদেশে আপনারা যখন আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবস্থা বেশ খারাপ বলা যায়। বিগত কয়েক বছরে প্রতিবন্ধী নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েছে। অর্থাৎ সব পরিস্থিতি প্রতিকূলে। আমরা জানি আপনারা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধারণাগত পরিবর্তন আনছেন। অর্থাৎ নতুন ধারণায় কি আপনারা আন্দোলনকে প্রসেস না প্রতিরোধ হিসেবে নিয়েছেন?

মোশাররফ হোসেন : দেখেন এবার এই দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো A Voice of our Own বা আমাদের কণ্ঠ। বিস্তারিতভাবে আমরা নিজেদের কথা বলতে এসেছি। হ্যাঁ এ কথা সত্য যে, দেশের মানবাধিকার মানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মানবাধিকার পরিস্থিতি নাজুক। প্রতিবন্ধী নারীর ক্ষেত্রে সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সহিংসতার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলো প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে। ১৩টি জেলায় প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলো এসব ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সরকারি সংস্থাগুলোকে চাপ প্রয়োগ করেছে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। এই যে প্রক্রিয়া এটা কিন্তু এবারের মূল থিমকে স্পর্শ করেছে। প্রতিরোধ, প্রতিবাদ বা অন্য যে সব কাজ আমরা করেছি তাতে সরকারের কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক না হলেও সাড়া পেয়েছি। তো আমাদের যাবতীয় কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনগুলো অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং করছে। এর ফলে তারা আগামীতে সংগঠিত ও শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হবে। সুতরাং আমরা প্রসেস ও প্রতিরোধ দু'ক্ষেত্রেই আছি।

২০০০ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় বৈষম্য বড় বাঁধা। বৈষম্য দূর করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলন কি ভূমিকা রাখছে?

মোশাররফ হোসেন : বৈষম্য কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় বৈষম্য তৈরি হয়েছে। শুরু থেকেই প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজ, পরিবার বা রাষ্ট্র উদাসীন থাকায় বৈষম্য কংক্রিটের মতো জগদ্দল পাথর হয়ে বসেছে। কিন্তু আন্দোলনের ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা বলার জন্য একটা প্লাটফর্ম তৈরি হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যে অভাব রয়েছে তারা তা দাবি আকারে বলতে পারছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে

প্রতিবন্ধীদের জন্য সংসদে১০টি আসন সংরক্ষণ করা হোক

শেখ ইউনুস আলী *কুষ্টিয়া*

রাষ্ট্রের কাছে আশা করবো প্রতিবন্ধীদের অধিকারগুলো আইনগতভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করে দেওয়ার, যেগুলো ২০০১ সালে যে গেজেট হয়েছে, সে গেজেটটা পুরোপুরি বাস্তবায়ন তাড়াতাড়ি হয় সেটাই আমার রাষ্ট্রের কাছে আশা। প্রতিবন্ধীরা লেখাপড়া করতে গেলেও বাধা পাচ্ছে। চিকিৎসা করতে গেলেও বাধা পাচ্ছে এবং চাকরির কথাই তো আসছেই না। প্রতিটি জেলায় অন্তত একটা করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি প্রতিবন্ধীদের জন্য হয় তাহলে দক্ষতা অর্জন করা প্রতিবন্ধীদের পক্ষে খুব সহজ হবে। চিকিৎসার অবস্থা আমাদের কুষ্টিয়া জেলায় যেটা অসুবিধা ছিল ডাক্তার সাহেবদের সাথে সিভিল সার্জনের সাথে বৈঠক করে আমরা কিছুটা সুরাহা করতে পেরেছি। আমরা মনে করি প্রতিবন্ধীদের জন্য সংসদে ১০টি আসন সংরক্ষণ করা হোক।

বলতে পারে, এমন ধারণাই তো ছিলো না। আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট পরিবর্তন। তো বৈষম্যগুলো দূর করার ক্ষেত্রে আমরা একটা শক্তিশালী কণ্ঠস্বর তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর এক সঙ্গে আওয়াজ তুলছে আমরা আমাদের অধিকারগুলো চাই। আন্দোলন করতে গিয়ে স্বাভাবিক বৈষম্য আর নতুন নতুন জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে পারছে।

২০০০ : এটা আমরাও অস্বীকার করছি না। কিন্তু এক্ষেত্রে আইন, সরকারি নীতি অনেক বিষয় জড়িত।....

মোশাররফ হোসেন : আপনার ধারণা খুবই সত্য। আমরা এখন জায়গাগুলোর ওপর জোর দিচ্ছি। আমরাও বুঝতে পারছি প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনের বাস্তবায়ন হওয়া দরকার। পিআরএসপি বা দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্থান হওয়া দরকার। সরকার পলিসি তৈরির ক্ষেত্রে যে সব দলিল করছে সেখানে যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ থাকে সে জন্য আমরা কাজ করছি। আমরা এতোদিন গ্রাম পর্যায়ে কাজ করেছি। এখন আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইস্যুগুলোকে নিয়ে আসছি। এই অভিজ্ঞতা আমরা প্রতিবন্ধী সংগঠন যেগুলো আছে তাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এতে করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা যৌথ শক্তির উদ্ভব হচ্ছে।

২০০০ : খুবই ভালো কথা। যৌথ শক্তির ধারণাটি অভিনব ও শক্তিশালী। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের যে থিম, এই ধারণায় এই থিম প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলো কিভাবে উপকৃত হবে?

মোশাররফ হোসেন : খুবই ভালো প্রশ্ন। আমরা আগে ১২টি জেলায় কাজ করতাম। এ বছর আমরা ২২টি জেলায় কাজ করছি। এডিডির পরিকল্পনা হলো আগামী ৫ বছরে ৩২টি জেলায় কাজ করবে। আগেই বলেছি এডিডি তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করেছে। তৃণমূল সংগঠনগুলোর ক্যাপাসিটি বিল্ড করার জন্য আমরা তাদের প্রচুর প্রশিক্ষণ দিয়েছি। অন্যান্য সংগঠনগুলোর রিসোর্সগুলোকে আমরা কাজে লাগাতে চাচ্ছি। কিছু কিছু কাজে লাগাচ্ছিও। মিডিয়া অ্যাডভোকেসি আমাদের পরিকল্পনার অন্যতম অংশ। মিডিয়ার গুরুত্ব জাতীয়/আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়েই সমান। আগামী দশ বছর মিডিয়া অ্যাডভোকেসি করবো। মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দাবি দাওয়াগুলোকে আমরা সরকার ও জনগণের সামনে তুলে ধরবো। এতে দুটো লাভ হবে। একটা হলো মিডিয়া সরকারকে চাপ প্রয়োগ করবে আবার জনগণকে সচেতন করে তুলবে। এসব জায়গায় যৌথ শক্তির কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগের আমরা সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চাই।

২০০০ : এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতার অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

মোশাররফ হোসেন : আমরা এ লক্ষ্যে অনেকদিন ধরেই কাজ করছি। দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পার্লামেন্টে সংরক্ষিত আসন দাবি করছি। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতার অংশীদারিত্ব বা প্রতিনিধিত্ব চাচ্ছিলাম। এই প্রক্রিয়ায় গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৮০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলো। সরাসরি জনগণের ভোটে এদের মধ্যে ১৬ জন বিজয়ী হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় আমরা আছি। রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইস্যুটিকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছি। যাতে করে রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিবন্ধীদের দাবিগুলো পূরণের ক্ষেত্রে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ থাকে। শুধু তাই নয়, কর্পোরেট সেক্টরেও যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা চাকরির সুযোগ পায় সেজন্য আমরা অ্যাডভোকেসি করছি। নাটোরের লাঠি বাঁশি সমিতিতে ইতিমধ্যেই কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাকরি হয়েছে। এ জায়গাগুলোতে এডিডি বাংলাদেশ কাজ করছে। অন্যদিকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের অবস্থা করুন। আমরা স্বাস্থ্য, শিক্ষানীতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব চাচ্ছি। এটাই তো ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া।

২০০০ : আপনারা মুভমেন্ট এপ্রোচ পরিবর্তনের কথা বলছেন? কিন্তু সমস্যা তো অনেক...

মোশাররফ হোসেন : আমি বিশ্বাস করি সমস্যা থেকেই সম্ভাবনা তৈরি হয়। এপ্রোচ পরিবর্তন মানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেরাই তাদের সংগঠন চালাক,দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলুক এটা আমরা চাচ্ছি। যে কারণে প্রথমে ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ করার কথা বলছি। যে নতুন ১০টি জেলায় কাজ শুরু হয়েছে এটা কিন্তু এডিডি নয়, তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলো করেছে। নতুন জেলাগুলোতে আমরা সহযোগিতা দেবো। তারা যখন স্বনির্ভর হবে তখন এডিডি নতুন জায়গায় চলে যাবে। এক সময় সারা দেশব্যাপী স্থানীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন নিজেরাই এই কাজগুলো করবে। এডিডির তখন আর প্রয়োজন হবে না।

২০০০ : প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন সংবিধান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার কিভাবে সংরক্ষণ করে?

মোশাররফ হোসেন : বাংলাদেশের সংবিধান মূল্যবান দলিল। সংবিধান কোথাও বৈষম্য করে নাই। বরং রাষ্ট্রের সব নাগরিকদের অধিকার রক্ষার কথা বলেছে। সমস্যা হচ্ছে সংবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারছে না। যারা সংবিধানের আলোকে আইন প্রণয়ন করে তাদের দ্বারাই এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। জন্ম থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা না শুনতে শুনতে হ্যাঁ বলতে শেখে না। রাষ্ট্রীয় পলিসিগুলো এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। আমি মনে করি পলিসিগুলো করা হয়েছে সনাতনী চিন্তাভাবনা থেকে। এতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গুরুত্ব আর মেধাকেই অবহেলা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন কাজ করবে। কিন্তু এর সমর্থনে আরও কিছু আইন তৈরি করা দরকার।

২০০০ : 'এ ভয়েস অব আওয়ার ওন'-এই কণ্ঠস্বর কাদের? কাদের উদ্দেশে সম্মিলিত এই স্বর?

মোশাররফ হোসেন : এটা সবার জন্য। এই ভয়েস আমরা সমাজ, রাষ্ট্র এবং পরিবারের কাছে। আমরা চাই সামাজিক পরিবর্তন। দেখেন ৫৫০টি গ্রামে গ্রামীণ সংগঠনগুলো কাজ করছে। এবার ৫৫০টি গ্রামেই আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হবে। সরকারিভাবে রাজধানী ও জেলা পর্যায়ে দিবসটি পালন করা হবে। আমরা কিন্তু বিষয়টিকে গ্রামে নিয়ে গেছি। ফলে স্থানীয় জনগণ এই প্রোগ্রামে সকলে অংশগ্রহণ করবে। আমরা এই চেতনা সকলের কাছে পৌছে দিতে চাই। পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অনেক প্রোগ্রাম নিয়েছি। আশা করি জনগণের কাছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দাবি দাওয়াগুলো পৌছে যাবে।

প্রতিবন্ধীরা পরিবারেই প্রথম বাধার শিকার

সুশান্ত কুমার দাস *ফরিদপুর*

আমরা প্রতিবন্ধীরা সমাজের প্রতিটা স্তরে মিশে যেতে পারি নাই। আমাদের যে সমঅধিকারের দরকার সে অধিকারগুলো সমানভাবে পাচ্ছি না। আমরা চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা প্রতিবন্ধী সমাজের স্বাভাবিক মানুষের মতো চলাফেরা করবে। আমাদের প্রত্যেকের অধিকার যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সে জন্য আমরা কাজ করব। প্রতিবন্ধীরা যদি শিক্ষিত এবং চাকরি পাওয়ার মতো উপযুক্ত থাকে তবুও তাদের চাকরি বাংলাদেশ সরকার বা বিভিন্ন এনজিও বা কোম্পানি দিচ্ছে না। এ দিক দিয়ে আমরা অনেকটা আমাদের আধিকার থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে পরিবারে ও সমাজে মর্যাদা পায় না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পরিবারেই প্রথম বাধার শিকার। আমরা যেহেতু অনেক প্রতিবন্ধী বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ প্রতিবন্ধী, সেই ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য যদি সরকার আলাদা একটা মন্ত্রণালয় করত তা হলে আমার মনে হয় যে আরো সুন্দর হতো।

মানুষ হিসেবে সাধারণ আচরণ প্রত্যাশা করি

আব্দুল আলিম *মাগুরা*

শিক্ষা ক্ষেত্রেও বঞ্চিত রয়েছি বিশেষ করে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী, সাধারণ স্কুলে পড়তে পারছে না, অনেক স্কুলে র‍্যাম্পের ব্যবস্থা হয়নি, উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে বাধা আছে, তারা ভর্তি করতে চায় না। প্রতিবন্ধীরা খেলাধুলা করতে পারে কিন্তু সুযোগ পায় না। মূল্যায়নের অভাব, অবহেলা হলো প্রধান বাধা। রাষ্ট্রের কাছে দাবি আমরা যেন সমঅধিকার পাই, অন্যদের মতো কাজ করে খেতে পারি এবং সর্বস্তরে অংশগ্রহণ করতে পারি। মানুষ হিসাবে সাধারণ আচরণ প্রত্যাশা করি।

সমাজ থেকে কুসংস্কার এখনও দূর হয়নি

আনজেরা *ঝিনাইদহ*

বড় হতে চাই, মূল্যায়ন পেতে চাই, সমান অধিকার চাই, মিশতে চাই, চলতে চাই, সমাজে বড় হতে চাই। চলাচলে যাতে বাধা না থাকে, রাষ্ট্রে অধিকার পেতে চাই। যেকোনো কাজ যেন করতে পারি এটাই অধিকার। সমাজ থেকে কুসংস্কার এখনো দূর হয়নি। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে একত্রিত হয়ে সংগঠন করে বাধা দূর করতে চাই।

রাষ্ট্রের কাছে একটা দাবি প্রতিবন্ধীদের একটা বাজেট থাক

ময়না *কুষ্টিয়া*

সমাজ এখনও সচেতন হয়নি। এখনও প্রতিবন্ধীদের যে কটূক্তি করে ডাকা বা অশ্লীল ভাষায় কিছু বলা এটাও কিন্তু এখনও রোধ করা যায়নি। এটা কিছু কিছু মানুষের মধ্যে এখনও আছে। মনে হয় এগুলো দূর হয়ে যাবে। আমি পরিবারের কাছে এটাই আশা করি যে আমি যেটাতে বা আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটার প্রতি তারা আমাকে আরও উৎসাহ দেবে। প্রতিবন্ধীরা তাদের মতো সমাজের একটা মানুষ এটা তারা দেখবে বা অনুভব করবে। প্রতিবন্ধীরাও অপ্রতিবন্ধী মানুষের মতো সুযোগ সুবিধা পেলে সবকিছু করতে পারবে। এ সুযোগ-সুবিধা তারা দিক। রাষ্ট্রের কাছে আমি এটাই আশা করব, যে বাজেট করা হয় সে বাজেটে প্রতিবন্ধীদের জন্যও একটা বাজেট থাক।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের দাবি, প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়া

আবুল কাশেম *ঢাকা*

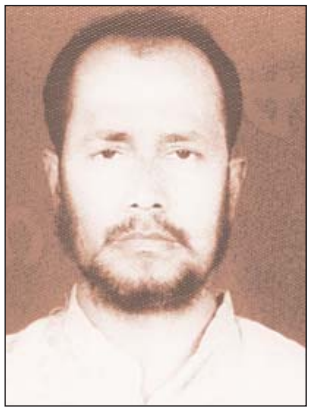

সমাজের অনেকেই আমাকে ল্যাংড়া বলে ডাকে। তাদের আমি বলি নাম ধরে ডাকেন। আমাকে ল্যাংড়া বলে ডাকলে আমার খুব খারাপ লাগে। আমরা রাস্তায় গেলে কোনো পরিবহনে উঠলে তারা আসন দিতে চায় না বা বসতে দেয় না, এমনকি ঘাড় ধইরা ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিতে চায় বা আমারেও দিয়েছে। শুনেছি দেশে একটা আইন হয়েছে কিন্তু কোনো দিন এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে শুনি নাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি বলতো যে এই প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েকে তোমরা স্কুলে ভর্তি করে দেও তাইলে মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের দাবি তিনি যেন পেপার পত্রিকায় লিখে দেন যে প্রতিবন্ধীদেরও লেখাপড়া দরকার তাদের ভালো কাজ শেখা দরকার।

সোনা আনছে প্রতিবন্ধীরাই বিদেশ থেকে

মোঃ রুস্তম আলী *যশোর*

সমাজের সর্বস্তরে যাতে স্থান পাই সেটাই আমাদের পাওয়া। সমাজের কাছে যেন অবহেলিত না থাকি, একজন অপ্রতিবন্ধী যেভাবে চলতে পারে সেরকম চাই। আমার অধিকার চাই, ১ কোটি ৪০ লক্ষ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী আছে এদের নিয়ে সরকার এর আগে অবহেলা করেছে, এখন যা কাগজপত্রে শুনি তাতে মনে হয় সরকারও একটু মূল্যায়ন করছে। ছেলেমেয়ের যোগ্যতা হিসাবে অধিকার চাকরি পাওয়ার। সুযোগ পেলে প্রতিবন্ধীরাও অনেক কিছু করতে পারে। বাংলাদেশে এখন সোনা আনছে প্রতিবন্ধীরাই বিদেশ থেকে, এটাই পাওয়া প্রতিবন্ধীদের ।

সবাই একতা হওয়া লাগবি

মোসাঃ জোসনা খাতুন *বগুড়া*

যানবাহনে চলাচলের ক্ষেত্রে আগে আমাদেরকে বাসে লেয় না, লিলে মনে করে যে তাদের বাসে সিট দেওয়া যাবি না। ফির আন্দোলন করা লাগবি। সবাই একতা হওয়া লাগবি। ডিসিক নিয়ে এসপিক নিয়ে হুইপকে নিয়ে বাধা দূর করা যাবে। মৌলিক অধিকার কিছু কিছু পাওয়া গিছে আর কিছু কিছু পাওয়া যায় না। মনে করেন যে শিক্ষা আমার হয় নাই, চিকিৎসা মনে করেন যে হয়েছে।

মিলেনিয়াম ডিজেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একীভূত, বাধামুক্ত এবং অধিকার ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য ২০০২ সালের মে মাসে জাপানে জাতিসংঘের এসক্যাপ কর্তৃক খসড়া মিলেনিয়াম ডিজেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক গৃহীত হয়। খসড়া ফ্রেমওয়ার্কটি বাধামুক্ত এবং অধিকার ভিত্তিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কর্ম পরিকল্পনা ও কৌশলের একটি দিক নির্দেশনা দেয়, ৭টি প্রধান ক্ষেত্র খুঁজে বের করে, ১৮টি লক্ষ্য ও ১৫টি কৌশল চিহ্নিত করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নাগরিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার রক্ষার জন্য অধিকার ভিত্তিক ধারাকে নিশ্চিত করবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীল সংগঠন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সেল্ফহেল্প অর্গানাইজেশনগুলো অনেক বেশি সংগঠিত, তাদের নিজেদের পক্ষে বলার জন্য অনেক বেশি জানে এবং এরাই

পারে তাদের সম্পর্কিত বিষয়গুলোর সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক অবদান রাখতে। পরিবর্তন আনয়নের জন্য দুটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

■ ২০০৪ সালের মধ্যে সরকার, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাসমূহ এবং এনজিওগুলোকে অবশ্যই পলিসি গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীল সংগঠনগুলোর বিকাশে সহায়তা করতে পারে।

■ ২০০৫ সালের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীল সংগঠনগুলোর পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। এই কার্যক্রমটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নীতি নির্ধারণে, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে এবং দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের ক্ষেত্রসমূহে অন্তর্ভুক্তি ঘটাবে।

প্রতিবন্ধী নারী

একজন নারী হিসেবে, একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে এবং সমাজের দরিদ্র ব্যক্তিদের একটি বড় অংশের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিবন্ধী নারীর সমস্যাগুলো আরো বহু গুণে বেড়ে যায়। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ৩টি লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

■ ২০০৫ সালের মধ্যে প্রতিবন্ধী নারীর অধিকার রক্ষার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

■ ২০০৫ সালের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীল সংগঠনগুলোকে প্রতিবন্ধী নারীর প্রতিনিধি নিশ্চিত করার জন্য নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

■ ২০০৫ সালের মধ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থাসমূহের মূল কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর সদস্যপদ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রারম্ভিক পরিচর্যা এবং শিক্ষা

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যেখানে ৭০% অ-প্রতিবন্ধী শিশু ও কিশোরেরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে সেখানে প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার সুযোগ ১০% এরও কম। এ সুযোগ থেকে বাদ পড়ার ফলে প্রতিবন্ধী শিশুরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যা সমাধানে ৩টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

■ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এর আওতায় শিশু প্রতিবন্ধীরাও হবে জনসংখ্যার অপরিহার্য অংশ।আরো যেটা নিশ্চিত করতে হবে তা হলো ২০১৫ সালের মধ্যে ছেলে ও মেয়ে নির্বিশেষে সকল শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষ করবে ।

■ ২০১০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৭৫% প্রতিবন্ধী শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষ করতে সক্ষম হবে ।

■ ২০১২ সালের মধ্যে প্রতিটি নবজাতক ও বাড়ন্ত শিশু (০--৪) এলাকা ভিত্তিক প্রাথমিক পরিচর্যা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবার সুযোগ পাবে।

প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মের সুযোগ নাই। মূল স্রোতধারার শ্রম বাজারে তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। পর্যাপ্ত ট্রেনিং-এর অভাবে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে ওঠেনি । এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য ৩টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

■ ২০১২ সালের মধ্যে আই,এল, ও কনভেনশন স্বাক্ষরদানকারী অন্তত ৩০% দেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের বিষয়ক ১৫৯ চুক্তিতে সম্মত হবে।

■ ২০১২ সালের মধ্যে আইএলও কনভেনশন স্বাক্ষরদানকারী দেশ সমূহের মধ্যে অন্তত ৩০% দেশ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি ঘটাবে ।

■ ২০১০ সালের মধ্যে প্রতিটি দেশেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি ও আত্মকর্মসংস্থানের নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকবে ।

বিল্ডিং এবং যানবাহনের প্রবেশগম্যতা

বর্তমান পারিপার্শ্বিক পরিবেশে প্রবেশগম্যতার অভাব এখনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনে বাধার সৃষ্টি করে, যেমন পাবলিক যানবাহন ব্যবস্থা । বয়স্ক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে, এই সমস্যা ততই প্রকট আকার ধারণ করবে। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ২টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

■ এক্ষেত্রে সরকার তার দেশের গ্রামীণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবহন কাঠামো ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধাদি পরিকল্পনায় প্রবেশগম্যতার মান বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

■ ২০১২ সালের মধ্যে সকল ধরনের বর্তমান ও নতুন যানবাহনকে প্রবেশগম্য করে তুলতে হবে।

তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সুযোগ

গত দশ বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বহু সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

Networking এর ক্ষেত্রে, চাকরি ক্ষেত্রে এবং স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য যা সত্যি প্রয়োজন।

কিন্তু এটি প্রতিবন্ধী ও অ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে দূরত্ব বৃদ্ধি করেছে। ইনফরমেশন ও কমিউনিকেশন টেকনোলজির বর্তমান কাঠামোতে প্রবেশগম্যতার সমস্যা, ইন্টারনেট ও দক্ষতার অভাব এই বিভাজনটি সৃষ্টি করেছে।

গ্রামীণ এলাকায় এই সমস্যাটি আরো বেশি প্রকট। Multi media'র এই পরিবেশটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বাধার সৃষ্টি করছে। এই অবস্থার উন্নয়নে তিনটি লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে, যথা:

■ ২০০৫-এর মধ্যে কোন এলাকার অন্যান্য জনসাধারণের মত

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও ইন্টারনেট এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য সেবায় সম অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।

■ ২০০৪-এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের আন্তর্জাতিক ICT Standard অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে।

■ সরকার তার জাতীয় ওঈঞ পলিসিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৫ সালের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতার একটি দিক নির্দেশনা গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ সরকার ICT সেক্টরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রাইমারি স্কুলসহ শিক্ষার সকল স্তরে এই সুবিধা পৌঁছে দেয়ার প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে ৩টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ডিপ্লোমা ও ও ট্রেড কোর্সসমূহ চালু করেছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রায় ১৬০০০ এনজিও কাজ করছে কিন্তু তাদের মাঝে গুটিকয়েক মাত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এই সুযোগ উন্মুক্ত রেখেছে।

প্রতিবন্ধীদের দারিদ্র্য বিমোচন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দরিদ্রদের মাঝে দরিদ্রতম। ১৬০ মিলিয়ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে ৪০ শতাংশই দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করছে এবং তারা তাদের আর্থ-সামাজিক অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে।দারিদ্র্য এবং প্রতিবন্ধিতা একে অপরের অবস্থা আরো সংকটাপন্ন করে তুলছে, যখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকার প্রেতিবন্ধিতার নানান দিককে MDG baseline data collection analysis এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণ ফান্ড বরাদ্দ করতে পারে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

মিলেনিয়াম ডিজ্যাবিলিটি ফ্রেম ওয়ার্কের আলোকে বাংলাদেশের অবস্থান নির্দেশ করতে গেলে আমরা দেখতে পাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ে আত্মনির্ভরশীল সংগঠন গড়ে তোলার কাজটি করছে মাত্র গুটিকয়েক অর্গানাইজেশন। অ্যাকশন অন ডিজ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এডিডি) বাংলাদেশ তার অন্যতম।

১৯৯৫ সালে কুষ্টিয়াতে বিচ্ছিন্ন প্রতিবন্ধীদের সংগঠিত করে তাদের দক্ষ করে গড়ে তোলে অধিকার আদায়ের জন্য আত্মনির্ভরশীল সংগঠন গড়ে তোলার যে ধারা এডিডি বাংলাদেশ শুরু করেছিলো তারই

ধারাবাহিকতায় দেশের ১৩টি জেলায় ১৩০টিরও বেশি এলাকাভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল সংগঠন তাদের অধিকার আদায়ে সংগ্রামরত।

তাদের এই অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে আগামী বছর যোগ হতে যাচ্ছে আরো ১০টি জেলার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের জন্য এ বছর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৮০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, যার মধ্যে নির্বাচিত হয়েছে ১৫ জন। ৩০০ জনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে।

সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্যও তারা এলাকা সভা, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের অধিকারের কথা বলে চলেছে।

আসলে এই ধরনের আন্দোলনমুখী আত্মনির্ভরশীল সংগঠনগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করার কাজে সরকার ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাসমূহের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

আবার যদি বলি প্রতিবন্ধী নারীর কথা, আমাদের দেশে ৪.৫ মিলিয়ন প্রতিবন্ধী নারী আছে কিন্তু জাতীয় জেন্ডার পলিসিতে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এদের অন্তর্ভুক্তি ঘটানোর জন্য কোনো সঠিক নির্দেশনা নেই, উদ্যোগও নেই। এ দেশে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন আছে' কিন্তু প্রতিবন্ধী নারীর ক্ষেত্রে তা অংশত কার্যহীন হয়ে পড়েছে, যখন আদালত স্বয়ং বলছে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী নারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ সব অবহেলিত সুযোগ বঞ্চিত নারীর পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে আন্দোলনরত প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলো যারা দেশের বিভিন্ন স্থানের নির্যাতিত প্রতিবন্ধী নারীকে সঠিক বিচার পাইয়ে দিতে তাকে রুখে দাঁড়াতে প্রেরণা যোগাচ্ছে। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই কুষ্টিয়ার আয়েশা, বগুড়ার আল্পনা, গাইবান্ধার জহুরার মতো আরো অনেক প্রতিবন্ধীর জীবনে।

প্রতিটি সংগঠনই তাদের মাঝে নারী সদস্যপদ নিশ্চিত করছে এবং প্রতিটি প্রতিবন্ধী ফেডারেশন প্রতিবন্ধী নারীর জন্য সংরক্ষিত পদ নির্ধারণ করেছে।

এবারে আসি শিক্ষা প্রসঙ্গে, বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হলো 'সবার জন্যে শিক্ষা'। এক্ষেত্রে প্রাইমারী স্কুলে শিশু ভর্তির হার ৬৫%। কিন্তু যদি এ জায়গায় প্রতিবন্ধী শিশুর কথা ভাবা যায় তাহলে দুঃখজনক চিত্রই ভেসে উঠবে।

প্রাইমারী স্কুলগুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুর ভর্তির হার ৪%-এরও কম। এমনকি কোনো কোনো স্থানে এ হার ২%-এরও নিচে। যদিও এ দেশে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা ১.৬ মিলিয়ন। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ বৈষম্য প্রতিবন্ধী শিশুটিকে সমাজের বোঝা হয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য করছে।

এদের জন্য বিচ্ছিন্ন কয়েকটি স্কুল থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। সাধারণ স্কুলে এদের ভর্তি করার জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো পলিসি নেই।

এদেশে কর্মরত বড় বড় এনজিওদের উপ-আধুনিক শিক্ষা কর্মসূচিতেও এদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ নেই। একীভূত শিক্ষার ধারণাটি এখনো সবার কাছে প্রচলিত নয়।

এডিডি বাংলাদেশের সহায়তায় গড়ে ওঠা সংগঠনগুলো তার নিজ এলাকায় স্কুল মিটিং, শিক্ষকদের নিয়ে কর্মশালা, স্কুলের অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্র ও শিক্ষকদের সচেতন করে তুলে এলাকার প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। আবার যেকোনো উন্নয়নশীল দেশের জন্যই

বেকারত্ব একটি বড় ধরনের সমস্যা। কিন্তু যখন প্রশ্ন প্রতিবন্ধিতার, তখন দেখা যায় যে, সমস্যা আরো বেশি গুরুতর। আন্দোলনরত প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ১% কোটা বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন যা তাদের আন্দোলনের একটি বড় ধরনের সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

প্রাইভেট সেক্টরের চিহ্ন এখনো হতাশাব্যঞ্জক। তাই শিক্ষিত হয়েও অনেক বেশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ছোটখাটো ব্যবসা করে চলতে হচ্ছে।

যানবাহন এবং গড়ে তোলা শহর কাঠামোর অন্তর্গত বিল্ডিংগুলো প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে অসাম্যের গাঢ় রেখা এঁকে রেখেছে।

শুধু যে যে স্থানে এডিডি বাংলাদেশের সহায়তায়

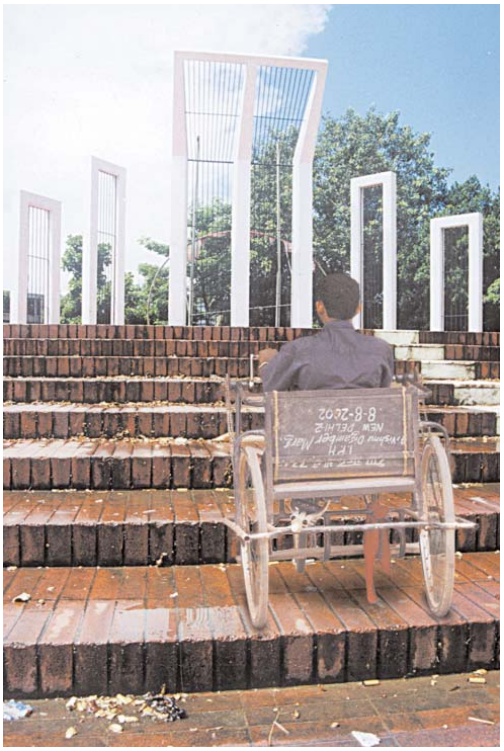

গড়ে ওঠা প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলো accessible transport-এর জন্য লড়ছে। বাস মালিক সমিতির সঙ্গে সভা করেছে, স্টিকার লাগাচ্ছে যে সব স্থানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। কোনো কোনো স্থানে (যেমন বগুড়া, দিনাজপুর ইত্যাদি) তারা বিনা ভাড়ায় বা অর্ধেক ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারছে। এদের আন্দোলনের ফলে সরকার কিছু কিছু উদ্যোগ নিচ্ছে যেমন- ভলভো বাস সার্ভিসে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা রয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় সত্যিই অপ্রতুল।

যদি সত্যিই এদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীল সংগঠনগুলোর আন্দোলনের পাশে সরকার ও অন্যান্য সব বেসরকারি সংস্থা আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতাসংস্থাসমূহ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসে তাহলে সত্যিই একটি একীভূত, বাধামুক্ত অধিকারভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

‘প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কোনো সরাসরি প্রোগ্রাম চালু নেই’

ড. হামিদুল হক, *চেয়ারম্যান*
বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম

সাপ্তাহিক ২০০০ : শিশুদের নিয়ে কাজ করেন। দেশে প্রচুর প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে তাদের জন্য আপনারা কি করছেন?

ড. হামিদুল হক : আমরা চাই প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। প্রতিবন্ধী শিশু বা ব্যক্তি মাত্রই অচল, পঙ্গু এই ধারণাটি আমরা ভাঙতে চাই। এ জন্য ব্যাপক সচেতনতার প্রয়োজন। আর আমরা সেই লক্ষ্যে সচেতনতার পাশে কাজ করে যাচ্ছি।

২০০০ : দেশের প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাস্থ্য শিক্ষা কোনটাই নিশ্চিত নয়। কিন্তু সাংবিধানিকভাবে এই অধিকার তাদের আছে। তা নিশ্চিত করার জন্য আপনাদের কোনো প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি আছে কি?

ড. হামিদুল হক : বাংলাদেশ ৫০ লাখের মতো প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে শিশু অধিকার সনদেও প্রতিবন্ধীদের কথা আছে। সাংবিধানিকভাবে নীতিমালাও আছে। কিন্তু আমার মনে হয় সামাজিক সচেতনতা ছাড়া কোনোটাই কার্যকর হবে না। ৭২টি এনজিও শিশু অধিকার ফোরামের সদস্য। আমরা তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে থাকি। সদস্যদের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেই যাতে প্রতিবন্ধী শিশুরা উপকৃত হয়। সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করি যেন প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার নিশ্চিত হয়। তবে আমাদের কোনো সরাসরি প্রোগ্রাম চালু নেই।

২০০০ : সরাসরি কোনো প্রোগ্রাম বা কার্যক্রম হাতে নেন না কেন?

ড. হামিদুল হক : যেহেতু এটি একটি ফোরাম তাই আমার মনে হয় এর মাধ্যমে সদস্যদের কার্যক্রমকে গতিশীল করে অনেক বেশি কার্যকরী ফলাফল লাভ করা সম্ভব।

২০০০ : প্রতিবছরের মতো এবারও পালিত হয়েছে শিশু দিবস, শিশু সপ্তাহ। কিন্তু বরাবরের মতো প্রতিবন্ধী শিশুরা হয়েছে অবহেলিত। কেন?

ড. হামিদুল হক : সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সচেতনতার কারণে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি অবহেলার মাত্রা অনেকটা কমে এসেছে। এ বছর শিশু সপ্তাহে নীলফামারীতে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল প্রশংসাযোগ্য। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের শিশু অধিকার বাস্তবায়ন মনিটরিং কমিটিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে বলে অঙ্গীকার করেছে।

২০০০ : বাংলাদেশ সরকার শিশু সনদসহ অনেকগুলো সনদে স্বাক্ষর করেছে। এসব সনদে প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বার্থ কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে?

ড. হামিদুল হক : বাংলাদেশ ১৯৯১ সালে শিশু সনদে স্বাক্ষর করেছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য এসব সনদের ফলাফল সন্তোষজনক নয়।

২০০০ : প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়ন বা কল্যাণে আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি কি?

ড. হামিদুল হক : আমাদের ইচ্ছা আছে বিভাগীয় পর্যায়ে চিলড্রেন পার্লামেন্ট করবো। এর ১০% আসন সংরক্ষিত থাকবে শিশুদের জন্য। প্রতিবন্ধী শিশুদের তুলে ধরার জন্যই আমরা তাদের অংশগ্রহণ চাচ্ছি। আমরা চাই কোনো করুণা নয়, তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে সবাই। এখন থেকে শিশু একাডেমিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, প্রতিযোগিতায় প্রতিবন্ধী শিশুরাও যেন অংশগ্রহণ করতে পারে, সে জন্য আমরা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে আনুষ্ঠানিকভাবে বলেছি। আশা করছি এখানেও আমরা সফল হবো।

২০০০ : রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার সব জায়গায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বৈষম্যের শিকার। শিশুদের ক্ষেত্রে তা আরো প্রকট। ফলে একজন প্রতিবন্ধী শিশুর বেড়ে ওঠাই বিঘ্নিত হয় নানাভাবে। এ ক্ষেত্রে আপনাদের অনেক কিছু করার সুযোগ আছে। আপনার কি মনে হয়?

ড. হামিদুল হক : আপনার অভিযোগটির সঙ্গে আমিও একমত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতো প্রতিবন্ধী শিশুরাও নানা ভাবে বৈষম্য, অবহেলার শিকার। আমাদের সমাজ একজন শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধীকে পাগল বা পঙ্গু হিসেবে দেখে যেটা খুবই অন্যায় এবং ভুল একটা ধারণা।

আমরা এর বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলছি। আমরা চাই একজন প্রতিবন্ধীকে যেন অবহেলার চোখে না দেখা হয়। তাদের যেন কাজের সুযোগ দেয়া হয়। আমরা চাই দৃষ্টিভঙ্গিটির পরিবর্তন হোক। সেই লক্ষ্যেই শিশু অধিকার ফোরাম কাজ করছে। আজকে বিসিএস পরীক্ষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে এটা সম্ভব হয়েছে মূলত সচেতনতার কারণেই।

অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ সনদ

সমগ্র পৃথিবী জুড়েই প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নানা পর্যায়ে নানাভাবে বৈষম্যের-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নিগৃহীত হচ্ছে প্রাপ্য অধিকার থেকে। পুষ্টিহীনতা, শিক্ষার অপ্রতুল অধিকার, রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেবাখাতে-প্রতিষ্ঠানে-দপ্তরে প্রবেশে বাধা, ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা, যৌন নিপীড়ন, নানাবিধ। যদিও বা অন্যান্য সর্বজনীন মানবাধিকার সংক্রান্ত দলিলে (যেমন- সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র, নাগরিক –রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক –সামাজিক– সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক দলিল, সিডও প্রভৃতি) প্রত্যেকজন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিধিমালা রয়েছে, এর কোনোটিতে কোনোখানে, বিশেষ করে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা বলা হয়নি । জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদেই কেবল প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের স্পষ্ট বিধান রয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইন সবসময়ই বিশেষ গোষ্ঠী যাদের বিশেষ অধিকার আবশ্যক তাদের কথা বিশেষ বিবেচনা করেছে। প্রয়োজনে বিশেষ দলিল প্রণয়ন করেছে। সিডিও কিংবা শিশু অধিকার সনদ এরই স্পষ্ট উদাহরণ। এর ক্ষমতাবলে এ এসব নিপীড়িত গোষ্ঠী বিশেষ কিছু অধিকার পাবে এবং এর সংরক্ষণে কাজ করবে রাষ্ট্র ও সমাজ। গত শতকের শেষ দিকে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত কমিটি তাদের এক পর্যবেক্ষণে চিহ্নিত করে যে, অধিকাংশ রাষ্ট্রই তাদের বিভিন্ন মানবাধিকার সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপনের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রসঙ্গটি সাধারণত এড়িয়ে যায়। তারা সুপারিশ করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে এবং তাদের জন্য বিশেষভাবে আইন, রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, কার্য্যক্রম প্রভৃতির উদ্যোগ নিতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ দশকের (১৯৮৩-৯২) মাঝামাঝি সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত World Programme of Action পর্যালোচনার সময়ে বিশেষজ্ঞেরা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান করে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯৩-এ Standard Rules on the Equaistion of Opportunities for Persons with Disabilities তৈরি হয়। যেখানে কীভাবে একটি সমাজ ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে, কোনো প্রকার বৈষম্য না করে তার প্রতিটি নাগরিককেই সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে, এর দিকনির্দেশনা রয়েছে। যদিও বা এই নীতিমালাগুলোকে মানা না মানার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

২০০০ এর মার্চে বিশ্বের কিছু আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (যেমন International Disability Alliance, Rehabilitation International, DPI প্রভৃতি), যারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায় ও উন্নয়নে কাজ করে চলেছে, চীনের বেইজিংয়ে মিলিত হয়, ফলশ্রুতি বেইজিং ঘোষণাপত্র। যেখানে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে একটি বিশেষ সনদ প্রতিষ্ঠার আহ্বানে সমর্থন এবং সক্রিয় সহযোগিতার অনুরোধ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০০ এর এপ্রিলে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার সংক্রান্ত হাইকমিশনারকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রয়োগে একটি বিশেষ সনদের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নির্দেশনা দেয়। তারা এই সিদ্ধান্তে আসে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে বিশেষ একটি সনদের প্রয়োজন রয়েছে। ২০০১-এর ডিসেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ (রেজ্যুলিউশন ৫৬/১৬৮) সনদ তৈরি করতে একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করে। ২০০৩-এর জুনে এই কমিটি দ্বিতীয়বার মিলিত হয় এবং উপস্থিত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিবৃন্দ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, এই মুহূর্তে বিবেচ্য এই নয় যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায় ও সংরক্ষণে একটি বিশেষ সনদ প্রণয়ন করা হবে কি না বরং তা কবে নাগাদ হবে এবং কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে সেটাই মুখ্য।

রাষ্ট্রীয় আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়েই যেন একটি কার্যকর পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত হয় সেজন্য অস্থায়ী কমিটিতে নানা পর্যায়ে ১০০টি রাষ্ট্র এবং ৪২টি বেসরকারি সংস্থা অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। খসড়া দলিল রচনায় ইতিমধ্যেই একটি কর্মী দল (২৭টি রাষ্ট্র এবং ১২টি আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সংস্থা) তৈরি হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফোরামে তার অঙ্গীকার প্রকাশ করলেও সনদ প্রসঙ্গে আজ অবধি তার অবস্থান স্পষ্ট নয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক-বেসরকারি সংস্থা এবং সুশীল সমাজ এই উদ্যোগের গোড়া থেকেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে।

অধিকার তখনই পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব যখন সমাজের-রাষ্ট্রের প্রত্যেকে সে ব্যাপারে সচেতন থাকে, সার্বিকভাবে উদ্যোগী হয়। যেসব রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গ এই আন্দোলনে শরিক তাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন সনদটি মনিবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং প্রেক্ষাপটে তৈরি করা হয়। প্রতিটি পর্যায়ে এবং প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি, তা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ। যাদের জন্য এই সনদ তারা যেন স্বয়ং নিজেদের কথা বলে, বলতে পারে। যা কিনা অধিকারভিত্তিক কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান শর্ত এবং প্রতিবন্ধী আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। অন্যান্য যেসব বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে;

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সকল নাগরিক-রাজনৈতিক অধিকার (জীবনধারণের অধিকার, বাকস্বাধীনতা, ভোটাধিকার, সমাবেশের অধিকার প্রভৃতি) কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই যেন নিশ্চিত করা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সকল অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজের অধিকার প্রভৃতি) কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়াই যেন নিশ্চিত করা।

সকল পর্যায়ের, সব রকমের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের স্পষ্ট উল্লেখ করা।

বহুমুখী প্রতিবন্ধকতায় এবং বিশেষ অবস্থার কারণে যারা অধিক নিপীড়িত (যেমন, নারী, শিশু, দরিদ্র) প্রমুখ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রসঙ্গটি যেন বিশেষভাবে বিবেচনা করা।

সনদের নীতিমালা যেন রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে আইনের মাধ্যমে কার্য্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়, তা নিশ্চিত করা

সব অধিকার হতে হবে সহজগম্য, সহজলভ্য।

রাষ্ট্র যেন এ ব্যাপারে যাবতীয় পদক্ষেপ নেয় তা নিশ্চিত করা।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও যেন নির্ধারিত থাকে, নাহলে

অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।

আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়েই সরকারি-বেসরকারি সব রকমের সহযোগিতা নিশ্চিত করা যেন সনদের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ে এবং সংরক্ষণে কাজ করে চলেছে এমন প্রতিটি মানুষ সংস্থা এবং প্রতিটি যেন এই সনদ প্রণয়নে ও ব্যাস্তবায়নে স্ব স্ব ভূমিকা রাখতে পারে তা নিশ্চিত করা।

প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষ প্রতিবেদকের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করা।

শুরুতেই যেমন বলা হয়েছে, আর্ন্তজাতিক আইন সব সময়ই বিশেষ গোষ্ঠী যাদের বিশেষ অধিকার আবশ্যক তাদের কথা বিশেষ বিবেচনা করেছে। প্রয়োজনে বিশেষ দলিল প্রণয়ন করেছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আদায় ও সংরক্ষণে একটি বিশেষ জাতিসংঘ সনদের। যার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আদায় ও সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে পাশাপাশি জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকবে যারা এসব অধিকার নিশ্চিত করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, যেন সনদের প্রতিটি অংশ যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে, পর্যালোচনা করে প্রণয়ন করা হয়। দু' দশকের এই আন্দোলন, বাস্তবায়নে না হয় আরও এক দশক নিক, তবুও যেন এই দলিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় ভূমিকা রাখতে পারে।

'আমাদের আন্দোলন আরো আমরা জোর করব বা জোরদার করবো'

উম্মে কুলসুম রঞ্জনা *সভাপতি, মুক্তি প্রতিবন্ধী ফেডারেশন, মোকামতলা, বগুড়া*

প্রশ্ন : তৃণমূল সংগঠনগুলো জনসাধারণকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলন সম্পর্কে কিভাবে অবহিত করছে একটু বলবেন?

উত্তর : আমাদের সংগঠনগুলোতে এলাকা সভার মাধ্যমে, অ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে বা লবিং, সমাবেশের মাধ্যমে জনগণকে জানাচ্ছি। তাছাড়া নাটক, পত্রিকা, টিভিতে এবং সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জনসাধারণকে জানাচ্ছি।

প্রশ্ন : যে সমস্ত এলাকায় কাজ করছেন সে সব এলাকায় প্রতিবন্ধীদের প্রতি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোনো বৈষম্য আছে কি?

উত্তর : অবশ্যই আছে। প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধীদের মধ্যে দুইজন একই কাজ করছে কিন্তু নায্য পাওনাটা পাচ্ছে না বা তাকে দিচ্ছে না। অনেক সময় দেখা যায় যে দর্জির কাজ যারা করছে তাদেরকে দেখা যাচ্ছে যে নায্য মূল্যটা দিচ্ছে না।

চাকরির ক্ষেত্রে যে আইনটা ছিলো সেটার এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়ন শুরু হয়নি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্লাস হাসপাতালগুলোতে যে মানে সরকারিভাবে একটা ইয়া আছে সেটাই আমরা তেমনভাবে পাচ্ছি না। সমাজসেবা আমাদেরকে যতটুকু ইয়া করার দরকার, সেটা পাচ্ছি না ওখানেই আমাদের বৈষম্য আছে। তাছাড়া চলাচলের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সংরক্ষিত দুইটা আসন আছে সে আসনগুলোতে আমরা ঠিকভাবে বসতে পারছি না। গাড়ি থেমে আমাদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার কথা সেটা আমরা পুরোটা পাচ্ছি না। প্রতিবন্ধীদের অতি কষ্ট করে বাসে উঠতে হয়। বাসগুলো যদি একটু নিচু হতো আমাদের জন্য সুবিধা হতো।

প্রশ্ন : আপনার কর্ম এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান কতটা ভালো? যার ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে আশার আলো দেখবে পুরো দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী।

উত্তর : যারা আমরা সংগঠিত হয়েছি, তারা আমরা ভালোই আছি পরিবারে এবং সমাজে।

আমরা ভোট পর্যবেক্ষণ করেছি সেটা দেখে অন্যরা ইয়ে করবে, আমরা নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করছি বা আন্দোলন করতেছি সেটা দেখে অন্যান্য প্রতিবন্ধীরা এগিয়ে আসবে। এতে অন্যরা আশার আলো দেখবে স্কুলে যে আমরা ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করে দিচ্ছি, তারা কোন পর্যায়ে ছিলো এখন কোন পর্যায়ে গেছে সেগুলো দেখে বা নাটক দেখে।

প্রশ্ন : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইতিবাচক পরিবর্তনে তৃণমূল প্রতিবন্ধী ফেডারেশন কিভাবে কাজ করছে?

উত্তর : আমরা অন্যান্য সংগঠন তৈরি করছি বা সেখানে কার্যকরী কমিটি গঠন করা হচ্ছে বা সেখানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন করা হচ্ছে। সে নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা মানে যে নেতারা নির্বাচিত হয়ে আসছে তারা আবার আমাদের সঙ্গে আমরা যেভাবে কাজ করছি সেভাবে তাদেরকে দেখে দেওয়া হচ্ছে কাজগুলো কিভাবে করতে হবে, কোনটা করলে কি হবে? সে জিনিসগুলো দেখে দেখে মনে করেন যে আমরা নির্যাতনের প্রতিবাদ করছি, ছাত্রছাত্রীদেরকে স্কুলে ভর্তি করে দিচ্ছি, র‍্যাম্পের জন্য মিটিং করতেছি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা কিভাবে চলাচল করতে পারবো সেগুলো তারা, আইন সহায়তা কি ভাবে করবে তার জন্য আমরা উকিলের কাছে যাচ্ছি বা গ্রামে যেগুলো আমাদের পরামর্শ দেওয়ার মতো লোক আছে তাদের কাছে যাচ্ছি। বিভিন্ন জায়গায় সম্পর্ক তৈরি করছি বা সাংবাদিকদের সঙ্গে। তাদের দিয়ে কাজ করে সংগঠনগুলো পরিবর্তন আনছে।

প্রশ্ন : দেশের সব জায়গায় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হবে কিন্তু এ দিবসে যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ সম্পৃক্ত না হয় তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কি?

উত্তর : আমরা তো একা একা থাকলে তো আলাদাভাবেই থাকবো। আমরা যে কোনো কাজ করলে তাদেরকে নিয়েই করবো বা আমরা আশা করি যে একা করা না আমাদের ডাকে তারা সাড়া দিবে। আমি আশা করি যে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে তারাও থাকবে।

প্রশ্ন : যদি সম্পৃক্ত না হয় তবে?

উত্তর : যদি না হয় তবে আমাদের আন্দোলনতো চলবেই, আমাদের আন্দোলন থেমে থাকবে না। এক জায়গায় যদি না আসে অন্য জায়গা তো আসবে। তারা ঐ জায়গায় দেখে বলবে হ্যাঁ এদের পেছনে আমাদেরকেও। আমার জানি আসবে টিভিতে, পত্রিকায় আমাদের দেখে অনেকটাই হয়েছে। হ্যাঁ এদের পেছনে আমাদেরও দাঁড়ানো উচিত। ওরা যদি না আসে বা আমাদের আন্দোলন কোনো দিনও থেমে থাকবে না। আমাদের আন্দোলন আরো আমরা জোর করব বা জোরদার করবো। তারা কেন আসল না? বা আমাদের কর্মসংস্থানটা আমরা আরো শক্ত করবো। যেন তারাও আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় এক সময়।

প্রশ্ন : এই দিবসে দেশের কাছে আপনি কি প্রত্যাশা করেন?

উত্তর : দেশের কাছে আমার এই প্রত্যাশা যেমন- ১৬ই ডিসেম্বর যেমন রাষ্ট্রীয় থেকে ইয়া পর্যন্ত সবাই পালন করে, আমাদের এই দিবসটা যেন রাষ্ট্র থেকে নিম্ন পর্যায়ে সবাই যেন এক সঙ্গে পালন করি। আমাদের যে আইনটা আছে সেটা যেন বাস্তবায়ন হয় পুরোদমে।

প্রশ্ন : প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতি নির্যাতন কিভাবে প্রতিরোধ করছো?

উত্তর : এটা আমরা পুরোপুরি প্রতিরোধ করতে পারিনি। যেটুকু পারছি আমরা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে, গ্রামে গিয়ে তার মুখে শুনে তার পরিবারের মুখে শুনে, আমরা গ্রামের লোকজন নিয়ে বসি। ওখানে যদি না হয় আমরা চেয়ারম্যান, মেম্বারকে নিয়ে বসি, তারা কি করে। তারপর ওতে না হলে থানা পর্যায়ে আমরা মামলা করে দিই। মামলা করে আমরা এসপির কাছে, ডিসির কাছে যাই। আমাদের কথাগুলো ইয়ে করি বা কেসের মাধ্যমে জনগণ জানতে পারছে যে, হ্যাঁ প্রতিবন্ধীরাও মানুষ। তারা আমাদের মতোই একজন। একজনকে দেখে দশজন এটা দেখে ভয় পাচ্ছে।

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন : নয়া মিলেনিয়াম ভাবনা

আতিউর রহমান

নয়া মিলেনিয়ামের শুরুতেই বিশ্ব জুড়েই নানা সৃজনশীল ভাবনার উন্মেষ লক্ষ্য করা গেছে। জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদ সুনির্দিষ্ট কিছু উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সব উন্নয়ন সংস্থাই এসব লক্ষ্য পূরণের তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে যারা দারিদ্র্যের কারণে পুরনো ঋণ শোধ করতে পারছিলো না তাদের সেই দায় মাফ করে দেবার আগে সুনির্দিষ্টভাবে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ পূরণের অঙ্গীকার সহ একটি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র তৈরির জন্যে চাপ দেয় আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ। পাশাপাশি যারা এতোটা দরিদ্র নয় অথচ কাঠামোগত সংস্কারের আওতায় ঋণ নিয়েছিলো তাদেরও এই কৌশলপত্র তৈরি করার জন্যে বলা হয়। এই কৌশলপত্র তৈরি করা হলেই তারা এসব দেশকে সহজ শর্তে নয়া ঋণ দেবে। বাংলাদেশ শেষোক্ত ক্যাটাগরির দেশ। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশ খসড়া দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র তৈরি করেছে। সেজন্যে সে ঐসব সংস্থা থেকে এক কিস্তি বিদেশী সাহায্যও পেয়েছে। এখন তাকে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে সব অংশীদারদের সঙ্গে আলাপ করে চূড়ান্ত পিআরএসপি তৈরি করতে হবে। কিন্তু খসড়া পিআরএসপি তৈরির পর পর প্রায় এক বছর চলে যাচ্ছে তবুও চূড়ান্ত পিআরএসপি প্রণয়নের তোড়জোড় খুব একটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। নিঃসন্দেহে গরিবদের মাঝেও সবচেয়ে অসহায় প্রতিবন্ধীরা। আলোচ্য পিআরএসপিতে তাদের দারিদ্র্য নিরসনে বিশেষ কোনো কর্মসূচির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে কিনা তাও স্পষ্ট নয়। আটটি মিলেমিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে-

** ২০১৫ সালের মধ্যে অতি দরিদ্র্য মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে।*

** ঐ সময়ের মধ্যে সব শিশুকে প্রাথমিক স্কুলে পাঠাতে হবে।*

** পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের মৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ কমাতে হবে।*

** এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়ার মোকাবেলা করা।*

** পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।*

** উন্নয়নের জন্য বিশ্ব অংশীদায়িত্ব গড়ে তোলা।*

২০১৫ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে আঠারো কোটি ৩২ লাখ। এক ডলারের কম আয়ের মানুষের সংখ্যা ১৯৯৬ সালে ছিলো ২৯%। তার মানে ২০১৫ সালে এই হার ১৪.৫% করতে হবে। অর্থাৎ ঐ সময় অতি দরিদ্র্য মানুষের সংখ্যা হবে দুই কোটি ৬৫ লাখ। আমরা যদি ধরে নেই যে মোট জনসংখ্যার ১০% প্রতিবন্ধী তাহলে ২০১৫ সালে ১ কোটি ৮০ লাখ প্রতিবন্ধী গরিব মানুষ বাংলাদেশে বাস করবে।

বৈষম্যহীন উন্নয়নের সংবিধানের অঙ্গীকার সত্ত্বেও চলমান উন্নয়নের ধারায় প্রতিবন্ধী বিশেষ করে অতিদরিদ্র প্রতিবন্ধীরা যুক্ত হতে পারছেন না। এদের বিশেষ অধিকারের কথা উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়করা আমলেই নিতে চান না। এদের কর্মসংস্থান নেই, লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগ নেই, পাবলিক সার্ভিস গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা নেই। সমাজও এদের প্রতি ততোটা সহানুভূতিশীল নয়। এই যে উন্নয়নের ধারায় বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধীদের যুক্ত করা যাচ্ছে না তাতে বিপুল পরিমাণের জাতীয় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে পরিবারকেই প্রতিবন্ধী সন্তানদের মানুষ করা এবং তাদের কর্মক্ষম করে তোলার ব্যয় বহন করতে হয়। এর ফলে প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে যে সব পরিবারে তাদের দারিদ্র্য আরও তীব্র হয়। তাছাড়া যারা প্রতিবন্ধী তাদের মতামতের ধারও কেউ ধারে না। সমাজ থেকে উপেক্ষিত এসব বঞ্চিত জনের দুঃখ দুর্দশা বিমোচনের জন্যে যে সংবেদনশীল নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন তাও উপলব্ধি করতে পারেন না প্রচলিত নীতিনির্ধারকেরা। সে কারণেই বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যাটি আরও তীব্র হচ্ছে। প্রতিবন্ধীসহ সুবিধা বঞ্চিত অসহায় জনগোষ্ঠীর জীবনচলাই এখানে দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। তাদের ভর্তি করাতে তেমন উৎসাহী নন। একটু বড় হতেই প্রতিবন্ধী মেয়েরা শারীরিক ও মানসিক যৌন নিপীড়নের শিকার হতে থাকে। অথচ তা প্রতিরোধে কোনো বিশেষ উদ্যোগ নেই।

আমরা এমডিজি পূরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের দুরবস্থার কিছু খন্ড চিত্র উপস্থাপন করলাম মাত্র। এ বিষয়ে গভীর গবেষণা নেই। তাদের চাহিদা নিরূপণের কোনো উদ্‌যোগ নেই। যদি কেউ মনে করে থাকেন যে সার্বিক দারিদ্র্য নিরসন ঘটলেই তার সুফল প্রতিবন্ধী গরিবের ঘরেও পৌঁছাবে তাহলে তিনি ভুল করবেন। কেন না যারা সমাজের মূলস্রোতেই

যুক্ত হতে পারছে না তারা কি করে মূল ধারার উন্নয়নের চুইয়ে পড়া ফসল ঘরে তুলবে? আর সে কারণেই প্রতিবন্ধী গরিবদের আলাদাভাবে ক্ষমতায়নের উদ্‌যোগ রাষ্ট্র ও সমাজকে বিশেষভাবে নিতে হবে। তাদের জন্যে বাজেটে আলাদা বরাদ্দ দিতে হবে। তাদের জন্যে ভৌত ও মানবিক শিক্ষার সুযোগ থেকেও প্রতিবন্ধীরা প্রায়ই বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশে প্রায় ষোল লাখ স্কুলগামী শিশু প্রতিবন্ধী। অথচ তাদের মধ্যে থেকে মাত্র ২০,০০০ শিশু স্কুলে যায়। আর যারা স্কুলে যায় তাদের চলাফেরার সুবন্দোবস্ত থাকে না সেখানে। শিক্ষকরাও খুব সহানুভূতির সঙ্গে তাদের দেখেন বলে মনে হয় না। অথচ সরকার এবং দাতা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে শতকরা একশভাগ শিশুই প্রাথমিক স্কুলে যাচ্ছে। তাহলে লাখ লাখ প্রতিবন্ধী শিশুরা কি নাই হয়ে গেল? তাদের হিসাবের মধ্যেও আনতে নারাজ নীতি নির্ধারকরা। ফলে তাদের জন্যে বিশেষ ধরনের শিক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা করা, অবকাঠামো গড়ে তোলা, মানবসম্পদ তৈরি করার প্রয়োজনও তারা অনুভব করেন না। তাহলে শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার সনদে স্বাক্ষর করে কি লাভ?

প্রতিবন্ধীদের মধ্যে যারা নারী তাদের ওপর বৈষম্য আও তীব্রভাবে হানা দেয়। মেয়ে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা দিতে ততোটা ইচ্ছুক নন গরিব বাবা মা। আমরা জামালপুরের এক অজপাড়াগাঁয়ের স্কুলের ব্যবস্থাপনা দেখতে গিয়েছিলাম। বাচ্চাদের সমাবেশে হঠাৎ অন্ধ হয়ে যাওয়া এক কন্যা শিশু বলেই ফেলল 'ওরা আমাকে স্কুলে পড়তে দেবে না। আমাকে ভর্তিই করবে না।' তার এই উচ্চারণ সমাজের ভেতরের অসঙ্গতিরই এক সুস্পষ্ট প্রকাশ। স্কুলের শিক্ষকরাও অবকাঠামো গড়ার অর্থ বাজেট থেকেই দিতে হবে। সমাজ যতক্ষণ প্রতিবন্ধীদের চাহিদা নিজের ভেতর 'ইন্‌টারনালাইজ' বা আত্মস্থ করছে ততোক্ষণ তাদের উন্নয়নের সমান অংশীদার করা বেশ কঠিনই হবে। সে কারণেই সরকার সিভিল সমাজ, ব্যক্তি খাত এবং দাতাগোষ্ঠীকে প্রতিবন্ধীদের মূলধারায় আনার প্রশ্নে কৌশলপত্র ঐক্যের পাতাকাতলে আসতে হবে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের সংগঠনগুলোকেও আরও সক্রিয় হতে হবে। তাদের এডভোকেসী কর্মসূচি আরও জোরদার করতে হবে। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধীদের পক্ষে সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির এই দিনে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা মোটেই কষ্টকর নয়। প্রয়োজন সমাজ ও রাষ্ট্রের শুভ দৃষ্টি। আরও প্রয়োজন তাদের উন্নয়নকে মানবিক জারক রসে সিক্ত করা। নয়া সহস্রাব্দের নয়া সময়ে উন্নয়নকে আর্থিক গন্ডির বাইরে এনে তাকে সব মানুষের যুক্ত প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলে প্রতিবন্ধীদের চাহিদা অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব হবে।

'বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে যথেষ্ট সংবেদনশীল'

এম ইসহাক ভূইয়া *ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন*

সাপ্তাহিক ২০০০ : দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন কি করছে?

ইসহাক ভূইয়া : ২০০১ থেকে প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু। সময়ের দিক থেকে হিসাব করলে এটি খুব দীর্ঘ সময় নয়। তারপরও আমি বলবো, বর্তমান সরকার বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট সচিব মহোদয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি খুবই আন্তরিক, সংবেদনশীল। প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে তাদের চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে আমরা, আমাদের ফাউন্ডেশন সব সময়ই একাত্ম। আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি বা কার্যক্রমও তাদের কথা চিন্তা করেই পরিচালিত হয়ে আসছে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত সুবিধা ছাড়াও ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করছি। এই সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও কল্যাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে চায়, যা এর আগে কোনো সরকারের ক্ষেত্রেই হয়নি।

২০০০ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে সরকারের অনেক কিছু করার আছে। প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের কি কি কার্যক্রম চালু আছে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা উন্নয়নের মূলধারায় ফিরতে পারবে?

ইসহাক ভূইয়া : সরকার ইতিমধ্যেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও কল্যাণে আগামীতে আরো কিছু স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের সুবিধা, অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রতিবছর ১০০টি বেসরকারি সংগঠনকে সাহায্য দেয়া হয়ে থাকে। স্থানীয়ভাবে সুইড বাংলাদেশকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয় তারা ৪০টি স্কুল পরিচালনা করে। 'কল্যাণী' নামে একটি এনজিও স্কুল রয়েছে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের। তারা প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণসহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। তাদের ৫৬ জন শিক্ষককে বেতন দেয়া হয় এখান থেকে।

২০০০ : বিওয়াকো মিলেনিয়াম ফ্রেম ওয়ার্কসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য অনেকগুলো লক্ষ্য আছে। আমাদের জানতে চাওয়ার বিষয় হলো, প্রতিবন্ধী ফেডারেশনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি যার মধ্য দিয়ে দেশের পুরো প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের ধারণা একটা রূপরেখা পাবে?

ইসহাক ভূইয়া : আমরা বিদেশীদের সাহায্য নিই না। বর্তমান বাজেটে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আমরা নিজস্ব অর্থেই আমাদের কর্মপ্রক্রিয়া পরিচালিত করি। আমি আগেই বলেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে যথেষ্ট সংবেদনশীল। দেশের পুরো প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও কল্যাণেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং এই লক্ষ্য আগামীতেও আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি, কার্যক্রম শুরু করবো। বাস, রেল সবখানেই তাদের আলাদা কাউন্টার হবে। ট্রেনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে তাদের জন্য কোটার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা বিমানেও চিঠি দিয়েছি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঋণ সুবিধা, ট্রেনিং দেয়া হবে। তারা যেন স্বাবলম্বী হতে পারে সে দিকটিতে আমারা বিশেষভাবে জোরারোপ করছি। চাকরি ক্ষেত্রেও তাদের বিশেষ সুবিধা দেয়ার বিষয়টি পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

২০০০ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে আইন আছে। কিন্তু দেখা গেছে সেই আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি। প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন কি করছে?

ইসহাক ভূইয়া : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে আইন বাস্তবায়নের জন্য সারাদেশে জাতীয় সমন্বয় কমিটি রয়েছে। আগামীতে সারা দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপর বিশেষ জরিপ করা হবে এবং তাদের আইডি কার্ড দেয়া হবে। এর মাধ্যমে তারা তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে। আর যে আইনের কথা বলছেন তাকে আরো সংস্কার ও কার্যকরী করে অচিরেই সংসদে পেশ করা হবে। বিষয়টি আইন মন্ত্রণালয়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০০০ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে সরকার প্রতিবছর অনুদান দেয়। ফাউন্ডেশন কতগুলো প্রতিবন্ধী সংগঠনকে এই অনুদান দিয়ে সহযোগিতা করে এবং এর পরিমাণ কত?

ইসহাক ভূইয়া : সারা দেশে প্রতিবছর ১০০টি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের মোট ১ কোটি টাকা অনুদান সহায়তা দেয়া হয়ে থাকে।

২০০০ : দেশের প্রতিবন্ধীদের জন্য এই অনুদান কি যথেষ্ট মনে করেন?

ইসহাক ভূইয়া : লোক সংখ্যা অনুযায়ী এটা যথেষ্ট নয়। আর্থিক সহযোগিতা পেলে প্রতিবন্ধীদের জন্য আরো কল্যাণকর অনেক কিছুই করা সম্ভব। তবে আগামীতে এই অনুদানের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি।

প্রধানমন্ত্রী আপনাকে ধন্যবাদ, তবে...

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলনে আরেকটি সাফল্যের মুকুট যুক্ত হলো। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা দিয়েছেন, এখন থেকে বিসিএস পরীক্ষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ১ শতাংশ কোটা বরাদ্দ থাকবে। সরকার প্রধান যে নিজ ইচ্ছায় বা তাদের সরকারি নীতি অনুযায়ী হঠাৎ করেই এই ঘোষণা দিয়েছেন ব্যাপারটা এমন নয়। বরং প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল। আরও নির্দিষ্ট করে বললে এটা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন এডিডি বাংলাদেশের আন্দোলনের ফসল। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলনের ইতিহাসে মাইলফলক বলে বিবেচিত হবে। প্রধানমন্ত্রী আপনাকে ধন্যবাদ। পিএসসির বৈষম্য দূরীকরণে আপনার সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সারা জীবন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বিবেচনা করবে।

পিএসসির বৈষম্যমূলক নীতির বিপক্ষে প্রথম অবস্থান নেয় এডিডি বাংলাদেশ। এই সংস্থার প্রধান মোশাররফ হোসেনের পুরো একাডেমিক কোরিয়ার ঈর্ষণীয় হলেও তাকে পিএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। কারণ তিনি প্রতিবন্ধী। যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন পিএসসির কারণে তা মুহূর্তেই ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। পিএসসির এই বৈষম্যের প্রতিবাদ করার জন্য তিনি একটা প্লাটফর্ম খুঁজছিলেন। এডিডিতে চাকরি পাবার পর তিনি সব জায়গায় এই বৈষম্যের ব্যাপারটি তুলে ধরেছেন। সাংবাদিকদের অনুরোধ করেছেন যেন এই বিষয়ে লেখালেখি করে। শুধু এ কারণে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে সবাইকে। চিন্তা করা যায় কত মেধাবী প্রতিবন্ধী ছাত্রকে পিএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। মেধাবী ছাত্রদের সেবা থেকে রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়েছে। শুধু পিএসসির কারণে কত জীবনকে হতাশায় পুড়তে হয়েছে এই জিজ্ঞাসা পিএসসিকে করা হলে তারা কি জবাব দেবে?

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা

তাদের অর্জন হিসেবে দেখছে। তারা খুশি, আনন্দিত, উল্লসিত। কথা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে এডিডি বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ মোশাররফ হোসেন সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানান। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তন তো আসছে। এটাই আমাদের অর্জন বা সাফল্য। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দাবি আদায়ের লড়াইকে উৎসাহিত করবে।'

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলন গত কয়েক বছরে একটা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পেয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে তারা এখন জাতির সামনে উদাহরণ হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন খুব ভালো কথা। তারপরও কিছু প্রশ্নবোধক চিহ্ন থেকেই যায়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পিএসসি'র কততম পরীক্ষা থেকে অংশগ্রহণ করতে পারবে সে বিষয়ক কোনো নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রী দেননি। অন্যদিকে পিএসসি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে কত দিনে বাস্তবায়ন করবে সেটাও একটা প্রশ্ন। প্রধানমন্ত্রী যদি পিএসসির জন্য নির্দিষ্ট একটা সময় বেঁধে দিতেন তবে খুব ভালো হতো। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর থেকে প্রতিবন্ধী ছাত্ররা পিএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। পরবর্তী পরীক্ষায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে কি? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে জানার জন্য অনেকবার পিএসসির চেয়ারম্যান, সচিব, কন্ট্রোলারের দপ্তরে ফোন করেও তাদের পাওয়া যায়নি। তাদের দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে তারা কোনো মিটিংয়ে বা অফিসের বাইরে আছেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের নেই।

পিএসসি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় অনেকেই সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে জানতে চেয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার ফলে তারা কি অন্য পরীক্ষার্থীদের মতো সরাসরি সব পরীক্ষার মাধ্যমে বিসিএসে উত্তীর্ণ হবে, না তাদেরকে শুধু মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হবে? এই বিষয়গুলোর উত্তর এখনই জানা প্রয়োজন। কিন্তু উত্তর যারা দেবে বা দিতে পারেন তারাই যদি নিশ্চুপ থাকেন তবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সামনে আশার আলো জ্বালবে কে? প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শুধু পিএসসির বৈষম্য দূরীকরণ নয়, রাষ্ট্রের সব পর্যায়ে তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাও সরকারের দায়িত্ব। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সরকারের অনেকগুলো সংস্থা রয়েছে। তাদের কাজ হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন সংক্রান্ত পলিসিগুলো সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে পৌঁছে দেয়া। বাস্তবে তারা কি করছে তাও সঠিক জানা যায় না। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন পিএসসিকে সহযোগিতা করবে বলে আশা করা যায়। সরকার প্রধান তাদের পলিসির ঘোষণা দেন, সরকারি কর্মকর্তারা তা বাস্তবায়ন করেন। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীও পিএসসির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রত্যাশা করে

এ ব্যাপারে পিএসসি খুব দ্রুতই পদক্ষেপ নেবে। প্রধানমন্ত্রী আপনাকে ধন্যবাদ, তারপরও আপনার কাছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরও অনেক দাবি আছে। তারা আশা করে আপনি পিএসসির মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্যান্য দাবির প্রতিও আপনি নজর দেবেন, সহানুভূতিশীল হবেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানসহ কোনো মৌলিক অধিকারই সুরক্ষিত নয়। যদিও সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে ব্যক্তির নাগরিক ও মৌলিক অধিকার সংবিধান অনুযায়ী রক্ষা করা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি শুধু পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বৈষম্যই নয়, তাদের প্রতি সহিসংতা, অত্যাচার, নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। সুতরাং তাদের প্রতি সরকারের দায়িত্বও অনেক বেশি হওয়া উচিত। ব্যাপারটি শুধু মানবিক আর সহযোগিতার নয়। মূল কাজ হচ্ছে বিশাল সংখ্যক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা। তাদের মূল ধারার বাইরে রেখে কোনোভাবেই রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের পথে বিশাল সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য। সরকারও দারিদ্র্য নিরসনে প্রচুর কাজ করছে। দারিদ্র্য দূর করতে সরকারের হাতে রয়েছে নানামুখী প্রকল্প। এই সব প্রকল্পে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব ও অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তা না হলে তারা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরেই থেকে যাবে। পিএসসি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত হওয়ার সুফল শুধু সরকারি কর্মকর্তা হওয়ার মধ্য দিয়ে আসবে না। বরং সরকারের নানা ধরনের পলিসির সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে সুফল আসবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সত্যিকারের উন্নয়ন কেউ চাইলে তাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার ও কাজ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। প্রতিবন্ধী সংগঠন ও ব্যক্তিরা ঠিক এই জায়গায়ই প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারের সরাসরি সহযোগিতা আশা করে।

জনগণের অধিকার রক্ষা করবে সরকার- এ এক মহান ঐতিহাসিক সত্য। পৃথিবীর সব দেশের সংবিধান রাষ্ট্র ও সরকারকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আজ যেসব দাবি তুলছে তার সবই সংবিধান অনুসারে পাবার কথা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারকে নিরাপদ আর সুরক্ষিত করার জন্য প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ পাস হয়েছে। কিন্তু আইনের বাস্তবায়ন নেই। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রত্যাশা করে, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী পিএসসির মতো প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনের যাতে দ্রুত বাস্তবায়ন হয় এ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা দেবেন। তিনি সুস্পষ্ট ঘোষণা দেবেন যেন আগামী সংসদ থেকেই এই আইনের প্রয়োগ শুরু হয়।

৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে এই দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের আগে পিএসসি সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পুরস্কার হিসেবেই বিবেচনা করছে। সরকার, পরিবার, রাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের গুরুত্ব বুঝে তাদের অধিকার রক্ষায় মিলেমিশে কাজ করে তবেই দিবসটি অর্থবহ হয়ে উঠবে।

মনে রাখতে হবে মানুষ মানুষের জন্য

নওয়াজেশ আলী খান

ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রোগ্রাম, এটিএন বাংলা

সাপ্তাহিক ২০০০ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে মিডিয়া কি ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

নওয়াজেশ আলী খান : এ ক্ষেত্রে মিডিয়া কিন্তু একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। আমার মনে হয়, ফাংশনাল কিছু না হলেও আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলে কিছু করা যায়। মোটিভেটিভ কিছু করা সম্ভব। খুব সরাসরি না হলেও এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে গঠনমূলক অনেক কিছুই করা সম্ভব। অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ সাধারণের মধ্যে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সচেতনতা তৈরির বড় কাজটি মিডিয়া করতে পারে। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির হয়তো একটি বিষয়ে শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধিকতা রয়েছে। অন্য অনেক বিষয়েই সে আর দশজনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় কিংবা তারা তো আমাদের পরিবারেরই সদস্য- মিডিয়া এ বিষয়গুলোকেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে তুলে ধরতে পারে।

২০০০ : আমাদের দেশে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবস্থান একেবারেই নিম্ন পর্যায়ে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন এবং কল্যাণে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের জন্য আপনার কি পরামর্শ রয়েছে?

নওয়াজেশ আলী খান : পরিবার থেকেই তো সমাজ রাষ্ট্র সবকিছু, তাই পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গির আগে পরিবর্তন হওয়া জরুরি। একটি পরিবারে হয়তো একজন বা দু'জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে। কিন্তু আর সবাই তো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পারিবারিক অবহেলা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিপর্যয়কর অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। আমি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার এক শিক্ষককে দেখেছি যিনি তার প্রতিবন্ধী মেয়েটিকে বাড়িতে বেঁধে রাখতেন। সবার সামনে যেতে দিতেন না। অথচ তার জ্ঞান, শিক্ষা আধুনিকতা কোনোটারই অভাব ছিলো না। এ ধরনের মূর্খতা শুধু তার একার নয়, অনেকের মধ্যেই কাজ করে। তারা পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্যদের নানাভাবে অবহেলা করে বঞ্চিত করে। ফলে এর প্রভাব গিয়ে পড়ে সমাজে, রাষ্ট্রে। যা একেবারেই অনুচিত এবং একই সঙ্গে অমানবিক।

২০০০ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলন বর্তমানে একটি রূপরেখা লাভ করেছে। এ আন্দোলনের সঙ্গে মিডিয়াকে কিভাবে সম্পৃক্ত হতে বলেন?

নওয়াজেশ আলী খান : আমি শুরুতেই বলেছি মিডিয়ার ভূমিকাটা এ ক্ষেত্রে বিশাল। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া সবাইকেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। আমি সৌদিতে দেখেছি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা সিম্বল ব্যবহার করা হয়। আমরা পত্রিকায় তাদের জন্য বিশেষ ফিচার করতে পারি, লিখতে পারি। একটি নাটকের মাধ্যমে হয়তো তাদের সমস্যাগুলোকে ফুটিয়ে তোলা যায়। আপনারা দেখেছেন, সাভার CRP থেকে 'বিহঙ্গ' নামে চমৎকার একটি ফিচার ফিল্ম হয়েছে। মূলত প্রতিবন্ধীদের আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার জন্য মিডিয়ার আন্তরিকতাই সবচেয়ে জরুরি।

২০০০ : রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অনেক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈষম্য দূরীকরণে মিডিয়া কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছেন?

নওয়াজেশ আলী খান : আমি পরিবারের কথা বলেছি। পরিবার থেকেই এই বৈষম্য ছড়িয়ে পড়ে রাষ্ট্র ও সমাজে। প্রতিবন্ধীরা সমাজের চোখে 'ভিন্ন কেউ', 'অন্য কেউ'। আমরা বুঝতে চাই না যে, তারা আলাদা সমাজের কেউ নয়। আমাদেরই আপন জন। বৈষম্য দূরীকরণে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। দৃষ্টিভঙ্গিতে সমতা আসতে হবে। মানসিকতায় সমতা আনতে হবে। মিডিয়া যে কেবল তাদের সমস্যা তুলে ধরবে তা নয়, তাদের সাফল্যের কাহিনী যদি প্রচার করা যায় তবে সেটার অ্যাচিভমেন্ট অনেক বেশি হবে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের মনে রাখতে হবে মানুষ মানুষের জন্য। আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য। প্রতিবন্ধীরা বিচ্ছিন্ন কেউ নয়, এটা মনে রাখতে হবে।

২০০০ : আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের মেসেজ আপনারা কিভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবেন বলে ভাবছেন?

নওয়াজেশ আলী খান : এটিএন বাংলা থেকে আমরা প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে বিশেষ প্রোগ্রাম, শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান প্রচারের কথা ভাবছি। তবে তা এখনো চূড়ান্ত নয়। আমরা এ ধরনের অনুষ্ঠান আমাদের দায়বদ্ধতা থেকেই করবো। সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই করবো।